বাংলাদেশের দশ জেলার ১০ মসজিদ

*মুসলিম স্থাপত্যের ঐতিহ্য আর কালের সাক্ষী হয়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে রয়েছে অনেক মসজিদ রয়েছে। দেশের প্রতিটি জেলায় প্রাচীনতম মসজিদ পাওয়া যায়। এমন প্রাচীন দশটি মসজিদ সম্পর্কে আমরা জানানোর চেষ্টা করবো। এনিয়ে নানা তথ্য জানাচ্ছেন **নূরজাহান খাতুন**।*

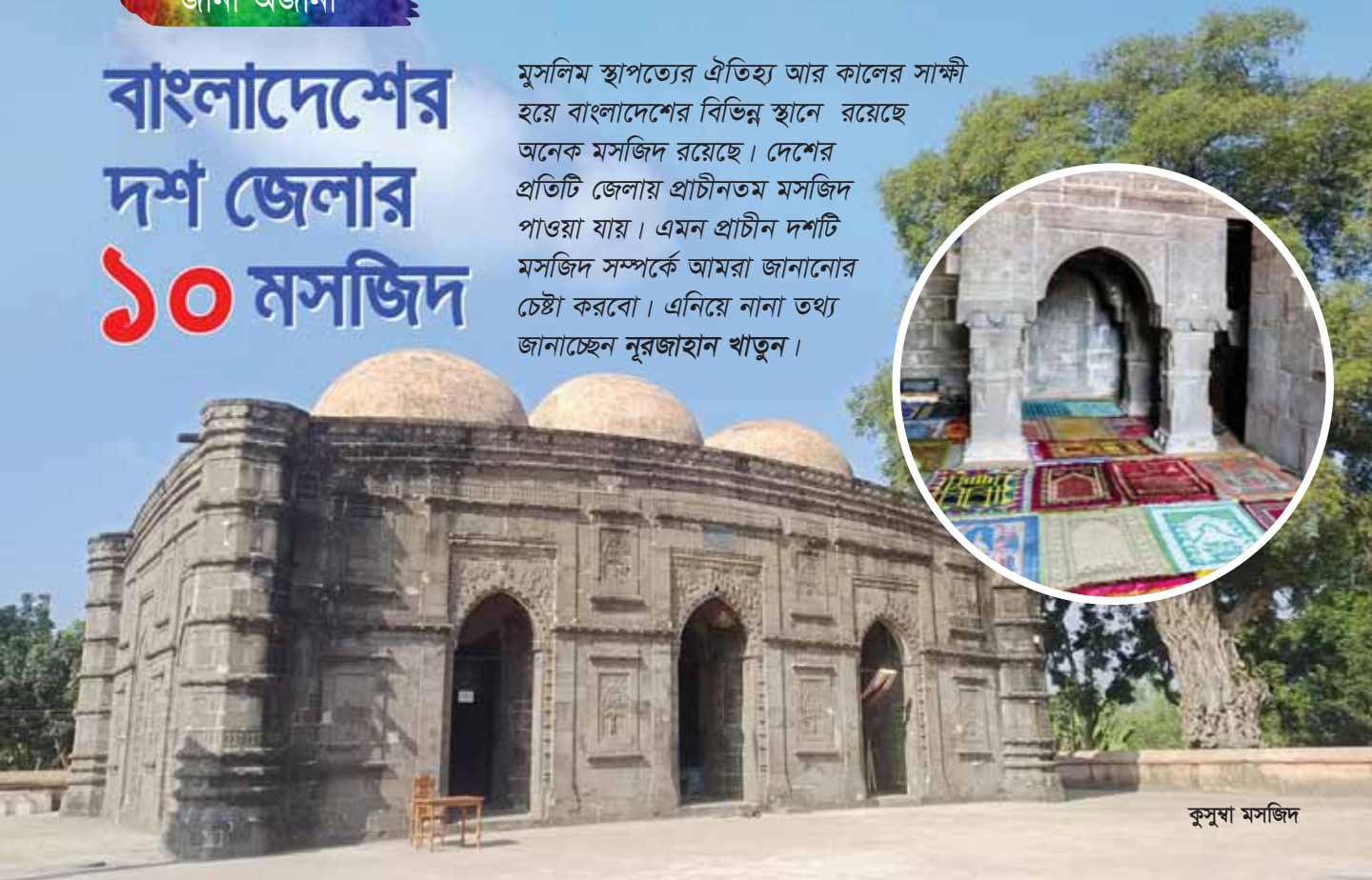

কুসুম্বা মসজিদ

১. নওগাঁ জেলার কুসুম্বা মসজিদ

সুলতানি আমলের ঐতিহ্য কুসুম্বা মসজিদ। প্রায় সাড়ে চারশ বছরের ঐতিহ্য ও স্মৃতি ধারণ করে দাঁড়িয়ে আছে মসজিদটি। নওগাঁ জেলা সদর থেকে প্রায় ৩৫ কিলোমিটার দূরে মান্দা উপজেলার কুসুম্বা গ্রামে অবস্থিত এই প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। মসজিদের প্রধান প্রবেশ পথের উপরে স্থাপিত আরবি শিলালিপি অনুসারে মসজিদটি ৯৬৬ হিজরি তথা ১৫৫৮-১৫৫৯ সালে নির্মিত। কুসুম্বা মসজিদটি উত্তর-দক্ষিণে ৫৮ ফুট লম্বা, চওড়া ৪২ ফুট। চারদিকের দেয়াল ৬ ফুট পুরু। মসজিদের সামনের দিকে রয়েছে তিনটি দরজা। এই কুসুম্বা মসজিদ সুলতানি আমলের একটি পুরাকীর্তি। মসজিদের ছাদের ওপর রয়েছে মোট ৬টি গম্বুজ। বাংলায় আফগানদের শাসন আমলে শূর বংশের শেষদিকের শাসক গিয়াস উদ্দিন বাহাদুর শাহর রাজত্বকালে জনৈক সুলাইমান মসজিদটি নির্মাণ করেন। তিনি একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন। ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পে মসজিদটি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তারপর আবার সংস্কার করা হয়। বাংলাদেশের ৫ টাকার নোটে মুদ্রিত আছে এর ছবি। রাজশাহী-নওগাঁ মহাসড়কের মান্দা ব্রিজের পশ্চিম দিকে ৪শ মিটার উত্তরে ঐতিহাসিক এই মসজিদের অবস্থান। নওগাঁ থেকে বাসে আসা যায় কুসুম্বা মসজিদে।

২. টাঙ্গাইল জেলার আতিয়া মসজিদ

টাঙ্গাইল জেলায় প্রত্নতাত্ত্বিক নির্দশনের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে আতিয়া জামে মসজিদ। টাঙ্গাইল সদর থেকে ৬ কিলোমিটার দক্ষিণে দেলদুয়ার উপজেলার আতিয়া গ্রামে মসজিদটির অবস্থান। এই মসজিদটি ঠিক কোন সময়ে নির্মাণ করা হয়েছে সে বিষয়ে সুনিশ্চিত তথ্য না পাওয়া গেলেও বেশ কয়েকটি শিলালিপির তথ্য থেকে ধারণা করা হয় যে খুব সম্ভবত ১৬০৮ থেকে ১৬১১ শতকের মাঝামাঝি কোনো এক সময়ে এটি নির্মিত হয়ে থাকতে পারে। আরবি 'আতা' থেকে 'আতিয়া' শব্দটির উৎপত্তি যার অর্থ হলো 'দানকৃত'। আলী শাহান শাহর বাবা আদম কাশ্মিরী (র.)-কে সুলতান আলাউদ্দিন হুসায়েন শাহ টাঙ্গাইল জেলার জায়গিরদার নিয়োগ করলে তিনি এই অঞ্চলে এসে বসবাস শুরু করেন। সেসময় তিনি ইসলাম ধর্ম প্রচারের এবং আনুষাঙ্গিক ব্যয় নির্বাহের জন্য আফগান নিবাসী শাসক সোলাইমান কররানীর কাছ থেকে সংলগ্ন এলাকা দান বা ওয়াকফ হিসাবে লাভ করেন। সেই থেকেই এ অঞ্চলটির নাম আতিয়া হয়ে থাকতে বলে মনে করেন ঐতিহাসিবিদরা। পরবর্তীতে বাবা আদম কাশ্মিরীর পরামর্শক্রমে সাঈদ খান পন্নী নামক সুফিজীর এক ভক্তকে মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীর উক্ত আতিয়া পরগণার শাসন কর্তা হিসেবে নিয়োগ করেন। এই সাঈদ খান পন্নীই ১৬০৮ সালে বাবা আদম কাশ্মিরীর কবরের সন্নিকটে আতিয়া মসজিদ নির্মাণ করেন। মুহাম্মদ খাঁ নামক তৎকালীন এক প্রখ্যাত স্থপতি এই মসজিদ নির্মাণের পরিকল্পনা ও নির্মাণ কাজে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। মসজিদটি থেকে একটি আরবি ও একটি ফারসি শিলালিপি পাওয়া যায়। এই লিপিগুলো থেকে মসজিদের নির্মাতার সময়কাল জানা যায়। মসজিদের চারকোণা অষ্টকোণাকৃতি মিনার রয়েছে। মসজিদটি টেরাকোটার তৈরি। বাংলাদেশের পুরানো দশ টাকার নোটে রয়েছে আতিয়া জামে মসজিদটির ছবি।

আতিয়া জামে মসজিদ

ষাট গম্বুজ মসজিদ

৩. বাগেরহাট জেলার ষাট গম্বুজ মসজিদ

ষাট গম্বুজ মসজিদ বাগেরহাট জেলায় অবস্থিত একটি প্রাচীন ও ঐতিহাসিক মসজিদ। বিশিষ্ট আউলিয়া আজম খানজাহান আলী (রা.) ১৫শ শতাব্দীতে মসজিদটি নির্মাণ করেন। এ মসজিদের ভেতরে ৬০টি স্তম্ভ আছে। প্রতি সারিতে ১০টি করে উত্তর থেকে দক্ষিণে ৬টি সারিতে এই স্তম্ভগুলো দাঁড়ানো। প্রতিটি স্তম্ভই পাথর কেটে বানানো, শুধু ৫টি স্তম্ভ বাইরে থেকে ইট দিয়ে ঢেকে দেওয়া। মসজিদের নাম ষাট গম্বুজ হলেও এর গম্বুজের সংখ্যা আসলে ৭৭টি। মিনারের চারটি গম্বুজ যুক্ত করলে এর মোট গম্বুজের সংখ্যা দাঁড়ায় ৮১টিতে। ষাটগম্বুজ নামকরণ নিয়ে জনশ্রুতি আছে, ৭টি করে সারিবদ্ধ গম্বুজ আছে বলে এ মসজিদের নাম ছিল আসলে সাত গম্বুজ। মানুষের মুখে মুখে ষাট গম্বুজ হয়েছে। আবার কেউ কেউ মনে করেন, গম্বুজগুলো ৬০টি স্তম্ভের ওপর অবস্থিত বলে 'ষাট খাম্বা' কালে কালে 'ষাট গম্বুজ' হয়ে উঠেছে। প্রাচীন এ মসজিদটিকে ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দে ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্য হিসেবে মর্যাদা দেয়। মসজিদটি বাগেরহাট শহরকে বাংলাদেশের তিনটি বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী শহরের মধ্যে স্থান করে দিয়েছে। বাংলাদেশের টাকাতেও ষাট গম্বুজ মসজিদ দেখা যায়।

৪. চাঁপাইনবয়াবগঞ্জ জেলার ছোট সোনা মসজিদ

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার শাহবাজপুর ইউনিয়নে অবস্থিত ছোট সোনা মসজিদ 'সুলতানি স্থাপত্যের রত্ন' বলে আখ্যাত। এটি বাংলাদেশের প্রাচীন মসজিদগুলোর মধ্যে অন্যতম। ছোট সোনা মসজিদের প্রধান প্রবেশপথের ওপরে স্থাপিত শিলালিপি থেকে জানা যায়, ১৪৯৩ থেকে ১৫১৯ সালের মধ্যে সুলতান হুসাইন শাহর শাসনকালে জনৈক মনসুর ওয়ালী মুহম্মদ বিন আলী ছোট সোনা মসজিদটি নির্মাণ করেন। প্রচলিত আছে, একসময় মসজিদের গম্বুজগুলো সোনা দিয়ে মোড়ানো ছিল। সে কারণেই এটি সোনা মসজিদ নামে পরিচিতি পায়। বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তের কাছে ভারতে আয়তনে বড় আরেকটি সোনা মসজিদ থাকায় এটি সবার কাছে ছোট সোনা মসজিদ নামে পরিচিত হয়ে উঠে। মসজিদের দেয়ালগুলো প্রায় ছয় ফুট পুরু এবং এগুলো তৈরিতে মাঝে ইট ও ভেতরে-বাইরে পাথর ব্যবহার করা হয়েছে। অন্যদিকে মসজিদের খিলান ও গম্বুজগুলো তৈরিতে শুধু ইট ব্যবহার করা হয়েছে। মসজিদের চারকোণে চারটি বুরুজ আছে। এগুলোর ভূমি নকশা অষ্টকোণাকার এবং বুরুজগুলোতে ধাপে ধাপে বলয়ের কাজ আছে। মসজিদের পূর্ব দিকের দেয়ালে ৫টি খিলানযুক্ত দরজা আছে। মসজিদের অভ্যন্তরের ৮টি স্তম্ভ ও চারপাশের দেয়ালের উপর তৈরি হয়েছে মসজিদের ১৫টি গম্বুজ। মসজিদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো বাইরের যে কোনো পাশ থেকে তাকালে কেবল ৫টি গম্বুজ দেখা যায়, পেছনের গম্বুজগুলো চোখে পড়ে না।

৫. রাজশাহী জেলার বাঘা মসজিদ

৫০ টাকার নোট আর ১০ টাকার স্মারক ডাকটিকিটে দেখা যায় প্রাচীন স্থাপত্যের অন্যতম নিদর্শন বাঘা শাহি মসজিদ। রাজশাহীর বাঘা উপজেলায় অবস্থিত টেরাকোটা শিল্পমণ্ডিত বাঘা মসজিদ দেশের অন্যতম প্রত্নসম্পদ। প্রত্নতত্ত্ববিদ আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়ার মতে, হযরত মাওলানা মোয়াজ্জেম-উদ-দৌলা বা মোহাম্মদ দৌলা ওরফে শাহ দৌলা নামে পরিচিত দরবেশের সুদূর প্রসারী খ্যাতির কারণে বহু শিষ্য-সাগরেদের আগমন ঘটে। শাহ দৌলার ওফাতের পর জ্যেষ্ঠ পুত্র মাওলানা আব্দুল হামিদ দানিশমন্দ তার স্থলাভিষিক্ত হন। এ সময় বাংলার সুলতান নাসির উদ্দীন নসরত শাহ ৯৩০ হিজরী (১৫২৩ খ্রি.) এখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। মসজিদের সম্মুখে একটি শিলালিপি স্থাপন করেন। বর্তমানে তা করাচি যাদুঘরে আছে বলে জানা গেছে। মসজিদ নির্মাণের সময় একটি জলাশয় খনন করা হয়। জলাশয়ের তীরে ১৬০ ফুট বাহু বিশিষ্ট বর্গাকারের এক খণ্ড উঁচু জমি। প্রাচীর ঘেরা এই উঁচু জমির পশ্চিমাংশে এ মসজিদ অবস্থিত। মসজিদের চারকোণে ৪টি বিরাট আকারের অষ্ট কোণাকৃতির মিনার আছে। মিনারগুলো কারুকাজ খচিত। মসজিদের অভ্যন্তরীণ অংশ উত্তর-দক্ষিণে দুই সারিতে ও পূর্ব-পশ্চিমে ৫ ভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক সারিতে ৫টি করে মোট ১০টি গম্বুজ ছিল। চারপাশের দেয়াল ও মসজিদের অভ্যন্তরে অবস্থিত ৪টি প্রস্তর স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত গম্বুজগুলো ১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দে প্রবল ভূমিকম্পে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। ১৯৮০ সালে গম্বুজগুলো আবার বসানো হয়েছে। টেরাকোটা শিল্পের অতুলনীয় নিদর্শন পাওয়া যায় এই মসজিদে।

দোলেশ্বর হানাফিয়া জামে মসজিদ

৬. ঢাকার দোলেশ্বর হানাফিয়া জামে মসজিদ

ঢাকার দক্ষিণ কেরানীগঞ্জের দোলেশ্বর ইউনিয়নে অবস্থিত এই মসজিদ নির্মিত হয় ১৮৬৮ সালে। বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদের পূর্ব পুরুষদের হাত ধরে ১৮৬৮ সালে মসজিদটি নির্মিত হয়। তখনকার জনসংখ্যা বিবেচনায় এটি ছোট আকারে নির্মাণ করা হয়েছিল। এরপর মসজিদটি একাধিকবার সম্প্রসারণ করা হয়। ১৯৬৮ সালে মিনারসহ মসজিদটির বর্ধিতাংশ নির্মাণ করেন অধ্যাপক হামিদুর রহমান। কয়েক বছর আগে মসজিদটি সংস্কার করে পুরানো রূপ দেয়ার উদ্যোগ নেন সংসদ সদস্য ও বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ। স্থপতি আবু সাঈদ এম আহমেদ এ সংস্কার কাজের নেতৃত্ব দেন এবং ২০১৮ সালে সংস্কার কাজ শেষ হয়। পুরানো মসজিদের পাশেই নির্মাণ করা হয় নতুন আরেকটি মসজিদ। পুরানো মসজিদটি এখন লাইব্রেরি এবং মক্তবে রূপান্তরিত হয়েছে। 'ইউনেস্কো এশিয়া-প্যাসিফিক অ্যাওয়ার্ডস ২০২১ সাইকেল ফর কালচারাল হেরিটেজ কনসারভেশন' পুরস্কার জিতেছে এই মসজিদ। মসজিদটি সংস্কার ও সংরক্ষণের জন্য স্থপতি সাঈদ মোস্তাক আহমেদ 'দ্য অ্যাওয়ার্ড অব মেরিট' পুরস্কার পেয়েছিলেন।

৭. মুন্সিগঞ্জ জেলার বাবা আদম মসজিদ

বাবা আদম শহীদ মসজিদটি মুন্সীগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার দরগাবাড়ি গ্রামে অবস্থিত। বাবা আদম মধ্যপ্রাচ্য থেকে ১১৭৩ সালে বিক্রমপুর পরগনার রামপালে এসেছিলেন ইসলাম প্রচার করতে। তিনি এক যুদ্ধে মারা গেলেও পরে তার স্মরণে সুলতান জালালুদ্দিন ফতেহ শাহের শাসনামলে মালিক কাফুর মসজিদটি নির্মাণ করেন। ৬ গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদটির দেয়াল তৈরিতে লাল পোড়ামাটির ইট ব্যবহার করা হয়েছে। অভ্যন্তরভাগে পশ্চিম দেয়ালে তিনটি মেহরাব রয়েছে আর পূর্ব দেয়ালে রয়েছে আরবি লিপিতে উৎকীর্ণ একটি শিলাফলক। উত্তর-দক্ষিণে লম্বা, সামনে খিলান আকৃতির একটি প্রবেশপথ রয়েছে। আর দু'পাশে রয়েছে সমান আকারের দু'টি জানালা। প্রবেশপথের ওপরে ফারসি অক্ষরে খোদাই করে কালো পাথরের ফলক লাগানো। ১৯৯১ সালে বাংলাদেশ ডাক বিভাগ বাবা আদম মসজিদের ছবি সংবলিত একটি ডাকটিকিট প্রকাশ করেছিল।

৮. বরিশালের মিয়াবাড়ি মসজিদ

বরিশাল সদরের কড়াপুর ইউনিয়নের রায়পাশা গ্রামে অবস্থিত মিয়াবাড়ি মসজিদ। ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দে নির্মিত বলে মনে করা হয়। বরিশালের হাতেম আলী কলেজের চৌমাথা থেকে ৯ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত মসজিদটি। মুঘল আমলে নির্মিত বাংলাদেশের একটি প্রাচীন মসজিদ। এ মসজিদটি দোতলা। মসজিদটির নিচে রয়েছে ছয়টি দরজা বিশিষ্ট আবাসন ব্যবস্থা। সেখানে মাদরাসার ছাত্রদের জন্য আবাসন ব্যবস্থা রয়েছে। দোতলায় মসজিদ জুড়ে চমৎকার নকশার কাজ রয়েছে। মূল মসজিদের রয়েছে তিনটি দরজা। মসজিদের চারপাশে পিলারের ওপর নির্মিত হয়েছে আটটি বড় মিনার। বড় মিনারগুলোর মাঝে রয়েছে ছোট ছোট ১২টি মিনি মিনার। আবার ছোট মিনারগুলোর মাঝে সুন্দর কারুকার্যময় নকশায় অলঙ্কৃত করা হয়েছে। মসজিদের মাঝখানে রয়েছে বড় তিনটি গম্বুজ। মধ্যের গম্বুজটি সবচেয়ে বড়। যার ভিতরের অংশেও রয়েছে কারুকার্যময় নকশার সমাহার। ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা হায়াত মাহমুদ এ মসজিদটি নির্মাণ করেন। বিদ্রোহের কারণে ইংরেজ শাসকরা তাকে প্রিন্স অব ওয়েলস দ্বীপে নির্বাসিত করেন। ইংরেজরা তার উমেদপুরের জমিদারিও কেড়ে নেয়। দীর্ঘ ১৬ বছর নির্বাসনে থাকার পর দেশে ফিরে তিনি দুটি দীঘি এবং দোতলা একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। মসজিদটি প্রাচীনকালে ইসলামপ্রিয় মানুষের রুচি ও স্থাপত্যশিল্পের সৌন্দর্যপিপাসু মানসিকতার পরিচয় দেয়।

৯. পাবনা জেলার চাটমোহর শাহী মসজিদ

৪০০ বছরের ঐতিহ্য তিন গম্বুজবিশিষ্ট পাবনা জেলার চাটমোহর শাহী মসজিদ। ক্ষুদ্র পাতলা জাফরি ইটে ও তিনটি গম্বুজের সমন্বয়ে মসজিদটি নির্মিত। দেয়ালের গায়ে হাজার বছরের পুরানো কারুকাজ রয়েছে। মসজিদের শিলাফলকের ফার্সি লিপি থেকে জানা যায় বিশাল এই মসজিদ বিখ্যাত সুলতান সৈয়দ বংশীয় প্রধান সৈয়দ আবুল ফতে মুহাম্মদ মাসুম খানের সময় নির্মিত হয়। কাকশাল গোত্রের সন্তান খান মুহাম্মদ তুকি খান ৯৮৯ হিজরি অর্থাৎ ১৫৮১ খ্রিষ্টাব্দে মসজিদটি নির্মাণ করেন। সম্রাট আকবরের শাসনামলে সৈয়দ নেতা আবুল ফতে মোহাম্মদ মাসুম খানের অর্থায়নে তারই সহোদর খান মোহাম্মদ কাকশাল কর্তৃক ১৫৮১ খ্রিষ্টাব্দে চাটমোহরে মসজিদটি নির্মিত হয়েছিল। মসজিদের দেয়াল প্রায় ৬ ফুট ৯ ইঞ্চি চওড়া। মিম্বারের পাশে কষ্টিপাথরের মতো কালো রঙের পাথর সৌন্দর্য ছড়ায়। মসজিদটিতে তিনটি দরজা বিশিষ্ট প্রবেশপথ রয়েছে। প্রবেশপথের তিনটি দরজার মধ্যে প্রধান প্রবেশপথে উঁচু দরজার ওপরে কালো পাথরের মাঝে খোদাই করে লেখা আছে 'কালেমা শাহাদাৎ'। অন্য প্রবেশপথ দুটি একই ধরনের। মসজিদটিতে তিনটি প্রবেশপথের সঙ্গে মিল রেখে পশ্চিম দেয়ালে রয়েছে তিনটি মিহরাব। কেন্দ্রীয় মিহরাব থেকে দুই পাশের মিহরাবে রয়েছে বড় সুরঙ্গের মতো অপূর্ব নিদর্শন। মসজিদের বাইরে জাফরান রঙের 'জাফরি ইট' ব্যবহৃত হয়েছে। দূর থেকে মসজিদটি বিশাল মনে হলেও ভেতরে মাত্র দুই কাতার মানুষ নামাজে দাঁড়াতে পারে।

১০. চাঁদপুর জেলার হাজীগঞ্জ বড় মসজিদ

চাঁদপুর জেলা সদর থেকে প্রায় ২০ কিলোমিটার পূর্বে রয়েছে ইবাদতের মারকাজখ্যাত হাজীগঞ্জ ঐতিহাসিক বড় মসজিদ। দৃষ্টিনন্দন এই মসজিদ দেশ-বিদেশে সবার কাছে খুবই পরিচিত। স্থানীয় বাসিন্দা আহমাদ আলী পাটওয়ারী ১৩২৫ বঙ্গাব্দের দিকে মসজিদটি প্রতিষ্ঠা করে। ১৩৩৭ বঙ্গাব্দের ১৭ আশ্বিন আহমদ আলী পাটওয়ারী (রহ.)র পরম ইচ্ছায় হযরত মাওলানা আবুল ফারাহ জৈনপুরী (রহ.) এর পবিত্র হাতে পাকা মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়। মসজিদের প্রথম অংশ (পূর্ব) ৪৭৮৪ বর্গফুট, মাঝের অংশ ১৩০০৬ বর্গফুট এবং শেষাংশ (পশ্চিম) ১৬১৫ বর্গফুট। সর্বমোট মসজিদের আয়তন ২৮৪০৫ বর্গফুট। মসজিদের প্রথম অংশের উপরের দিকে সুরা ইয়াছিন ও সুরা জুমআ লিপিবদ্ধ ছিল। সংস্কারের সময় তা উঠে যায়। মসজিদের অনন্য সুন্দর মেহরাবটি কাচের ঝাড়ের টুকরা নিখুঁতভাবে কেটে আকর্ষণীয় নকশায় সাজিয়ে তোলা হয়েছে। মাঝের অংশটি ৭৭টি আকর্ষণীয় পিলার ও ঝিনুকের মোজাইক দিয়ে নির্মিত। তৃতীয় অংশে রয়েছে তিনটি বিশাল গম্বুজসহ আকর্ষণীয় সুউচ্চ মিনার। ১৯৫৩ সালে ১২২ ফুট উঁচু এই মিনারটি নির্মাণ হয়। মসজিদের পূর্ব প্রাচীরে পবিত্র কালেমা শরিফ খচিত চিনামাটির টুকরা দিয়ে তৈরি মনোরম ফুলের ঝাড়ের মতো আকর্ষণীয় বিশাল ফটক।